

অর্থনীতির সাম্প্রতিক ঝুঁকি মোকাবিলার পথ কী?

সম্প্রতি প্রকাশিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ‘মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি’ কেবল একটি সাধারণ নীতিগত দলিল নয়, এটি দেশের অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন। কারণ, এটি প্রথমবারের মতো অর্থনীতির ঝুঁকিগুলোকে শুধু স্বীকারই করেনি, বরং সরকারি নথিতেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, নিম্ন প্রবৃদ্ধি, দুর্বল রাজস্ব আহরণ, বৈদেশিক খাতের চাপ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিপুল দায় এবং ব্যাংক খাতের ভঙ্গুরতা—সবগুলো ঝুঁকি একই সময়ে অর্থনীতিকে চাপে ফেলতে পারে।

এটি আমার কাছে বাস্তবতার কাছাকাছি একটি মূল্যায়ন মনে হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সমস্যাগুলো আমরা অনেক দিন ধরেই জানি। এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সঠিক রোগনির্ণয়ের পাশাপাশি কার্যকর সমাধান।

বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি দীর্ঘদিন ধরে ৯ শতাংশের আশপাশে অবস্থান করছে, অথচ প্রবৃদ্ধির গতি কমছে।

অর্থনীতির ভাষায় এটি একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। যখন মূল্যস্ফীতি বেশি থাকে কিন্তু উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়ে না, তখন অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্থবিরতার দিকে এগোতে থাকে। এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে কর্মসংস্থান, আয় ও বিনিয়োগ—সব ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ অবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারের বিভিন্ন নীতির মধ্যে কি যথেষ্ট সমন্বয় রয়েছে?

একদিকে বাজেটে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। উচ্চ সুদের হার এবং সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও একই সঙ্গে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা কঠিন।

বিনিয়োগকারীরা যখন উচ্চ সুদে ঋণ নেবেন, তখন নতুন শিল্প স্থাপন কিংবা উৎপাদন সম্প্রসারণে স্বাভাবিকভাবেই অনীহা তৈরি হবে। ফলে প্রবৃদ্ধি আরও মন্তর হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

তাই এখন প্রয়োজন রাজস্ব ও মুদ্রানীতির মধ্যে বাস্তবসম্মত সমন্বয়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই জরুরি, তবে সেটি এমনভাবে করতে হবে, যাতে উৎপাদনশীল খাত সম্পূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত না হয়। কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প, এসএমই এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাতগুলোর জন্য তুলনামূলক সহজ শর্তে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্য একটি বড় উদ্বেগের জায়গা হলো রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অন্তর্নিহিত আর্থিক দায়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ৮ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকার বেশি দায়, দুর্বল ব্যাংকগুলোর সম্ভাব্য পুনঃ মূলধনীকরণ, সরকারি গ্যারান্টি এবং বিচারাধীন বিভিন্ন মামলার সম্ভাব্য আর্থিক দায়—এসব ভবিষ্যতের বাজেটের ওপর বড় চাপ তৈরি করতে পারে। এই দায়গুলো আজ নগদ অর্থপ্রবাহ সৃষ্টি না করলেও আগামী দিনে সরকারের আর্থিক সক্ষমতাকে সীমিত করে দিতে পারে।

এই বাস্তবতায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার আর বিলম্ব করার সুযোগ নেই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা, পরিচালন দক্ষতা ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনা মূল্যায়ন করে প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্গঠন, করপোরেট গভর্ন্যান্স জোরদার এবং যেখানে সম্ভব সেখানে বেসরকারি অংশীদারত্ব বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে লোকসান বহনকারী প্রতিষ্ঠানকে কেবল সরকারি অর্থ দিয়ে টিকিয়ে রাখার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

একইভাবে ব্যাংক খাতের সংস্কারও এখন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত। দুর্বল ব্যাংকের তারল্যসংকট মোকাবিলার পাশাপাশি খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধার, সুশাসন নিশ্চিত করা, পরিচালনা পর্ষদের জবাবদিহি বৃদ্ধি এবং ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি আরও শক্তিশালী করতে হবে। ব্যাংকিং খাতের প্রতি জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরে আসবে না।

রাজস্ব আহরণেও কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। করের হার বাড়িয়ে নয়, বরং করের আওতা সম্প্রসারণ, কর প্রশাসনের ডিজিটাল রূপান্তর, তথ্যভিত্তিক অডিট এবং কর ফাঁকি কমানোর মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত এখনো আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় অনেক কম। তাই বিদ্যমান করদাতার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে নতুন করদাতাকে ব্যবস্থার আওতায় আনাই হবে সবচেয়ে কার্যকর কৌশল।

বৈদেশিক খাতের ঝুঁকিও অবহেলার সুযোগ নেই। রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, প্রবাসী আয়ের আনুষ্ঠানিক প্রবাহ বৃদ্ধি, বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনা এখন সময়ের দাবি। একই সঙ্গে আমদানি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় যথার্থভাবেই জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বড় ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রতিবার দুর্যোগের পর অতিরিক্ত বরাদ্দের ওপর নির্ভর না করে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় একটি স্থায়ী আর্থিক কাঠামো, শক্তিশালী দুর্যোগ তহবিল এবং কার্যকর ঝুঁকি বিমা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হবে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধান। সবশেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো নীতিগত বিশ্বাসযোগ্যতা। অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে অস্বীকারের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে অর্থ মন্ত্রণালয় যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে, সেটি ইতিবাচক। কিন্তু কেবল ঝুঁকি শনাক্ত করাই যথেষ্ট নয়। সেই ঝুঁকি মোকাবিলায় দ্রুত, সমন্বিত ও ধারাবাহিক সংস্কারের বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির সামনে শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে। জনসংখ্যাগত সুবিধা, শক্তিশালী তৈরি পোশাকশিল্প, ক্রমবর্ধমান দেশীয় বাজার এবং ভৌগোলিক অবস্থান—এসব আমাদের বড় সম্পদ। তবে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, নীতিগত ধারাবাহিকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি মূল্যস্ফীতি বা বৈদেশিক ঘাটতি নয়, সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো প্রয়োজনীয় সংস্কারকে আরও পিছিয়ে দেওয়া। সময়মতো নেওয়া কঠিন সিদ্ধান্তই ভবিষ্যতের বড় সংকট এড়াতে পারে।

- মামুন রশীদ: অর্থনীতি বিশ্লেষক